প্রথম অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর জীবন
ও
সাহিত্য কৃতির পরিচয়

'আশাপূর্ণা দেবী'র মতো সাহিত্যিকদের জীবন ও জীবনের সমস্তরকম সৃষ্ট সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য, সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁদের সাহিত্য-কর্মের যথার্থ মূল্যায়নের জন্যও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উঠে আসে। সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যিক অনেকটাই বাহ্য হয়ে যান। যদিও আমরা সাহিত্যকর্মের মাঝেই সৃষ্টিকর্তাকে পেয়ে যাই; তবুও গবেষণার প্রক্ষিতে ব্যক্তি ও তাঁর কর্ম দুইই প্রাধান্য পায়। 'আশাপূর্ণা দেবী' একজন মরমী কথাসাহিত্যিকের পরিচয়ে সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। মূলত তাঁর খ্যাতি গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বাঙালী জীবনের নানারকম বৈচিত্রকে উপন্যাসের কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। জীবনের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত কলমই ছিল তাঁর একমাত্র হাতিয়ার। তাঁর সাহিত্যিকজীবন ভালো করে বুঝতে হলে, অবশ্যই ব্যক্তি 'আশাপূর্ণাকে'ও সঠিকভাবে জানা দরকার। এইপ্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' সাহিত্য সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থের ভূমিকাংশে তিনি লিখেছেন –

''কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।

কবিতা দর্পণমাত্র –তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা কীর্তি –তাহা ত আমাদের হাতেই আছে–পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন তাহা বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য''[১]।

'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' যদিও কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে মন্তব্যটি করেছিলেন, তথাপি সাহিত্য সৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তিটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। তাই 'আশাপূর্ণা দেবী' রচিত উপন্যাস তথা কথাসাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে ব্যক্তি 'আশাপূর্ণা'কে আমাদের যথাযথ ভাবে জানা দরকার। কারণ ব্যক্তিজীবন মানেই জন্ম ও কর্মের বিস্তারিত আলোচনা, তাতে করেই একজন সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয়।

ঔপন্যাসিক 'আশাপূর্ণা দেবী' জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী (১৩১৫ সনের ২৪শে পৌষ)। তাঁর বাবার নাম 'হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত', মায়ের নাম 'সরলাসুন্দরী দেবী'[২]। তিনি ছোটবেলা থেকেই সমকালীন তথাকথিত সমাজের নানারকম কুসংস্কারের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার সমস্তক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাই ও দাদারা পড়াশুনা করার ও স্কুলে যাওয়ার অধিকার পেয়েছিল, কিন্তু তিনি ও তাঁর বোনেরা কেউ সেই অধিকার ভোগ করতে পারেননি। নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি ও সাধনায় তিনি অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু তা করতে তাঁকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয়েছিল, তিনি তাঁর ভাই ও দাদাদের সঙ্গে উল্টোদিকে বই পড়তে বসে উল্টো অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উল্টো অক্ষরজ্ঞান সোজা করে

নিয়ে, শিক্ষায় মনোযোগী হয়ে পড়েন। এবং কালক্রমে তিনি বোনেদের সঙ্গে কবিতা মুখস্থ করা, ও কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে একদিন সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার সাধনায় পূর্নতা প্রাপ্তি ঘটলে, তিনি সাহিত্যের দরবারে চিরকালের শ্রদ্ধার আসনটি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি যখন সাহিত্য রচনা শুরু করছিলেন তখন সাহিত্যাকাশে সর্বক্ষেত্রে রচনাগুণে 'রবি-প্রতিভা' পূর্ণপ্রভা দান করে ফেলেছিল। তা-সত্ত্বেও তিনি নিজস্ব প্রতিভায় চিরকালের শ্রদ্ধার সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অজানাকে জানার জন্য সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ সমস্তরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। শত-সহস্র বাঁধা থাকা সত্ত্বেও যা দুর্লভ অথবা যাকে সহজে জয় করা যাবে না। তার প্রতিই মানুষ তীব্র বাসনায় বহুবার ব্যর্থতার পরেও সাফল্যের চুঁড়ায় পৌঁছাতে চায়। 'আশাপূর্ণা দেবী'র ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হলে এরকমই কিছু তত্ত্বকথা উঠে আসতে পারে। কারণ তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের স্বীকৃতির পেছনে ছিল নানারকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি যেসময় জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন বাংলাদেশের মাটিতে অনেক সাহিত্যিক পূর্ণপ্রভায় বিরাজমান ছিলেন। সেই কৃতি-সাহিত্যিকদের পরিমণ্ডলে থেকেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মের মধ্য দিয়ে আলাদা পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সর্বকালের স্মরণীয় মরমী কথাকার হিসেবে কাল থেকে কালোত্তীর্ণ হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিকলগ্নে ১৯০৯-০১-০৮ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় গোটা শতাব্দী বাংলার সাহিত্যের জগতে বিরাজমান ছিলেন। সাহিত্যের জগতে নানারকম অমৃতের সন্ধান দিয়ে এই 'অমৃতস্য কন্যা' বিংশশতাব্দীর শেষলগ্নে ১৯৯৫-০৭-১৩ তারিখে কল্পলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

উল্লেখ্য 'আশাপূর্ণা দেবী' 'উত্তর কলকাতার পটলডাঙায়' তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা 'হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত' ছিলেন সেযুগের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। সেই সময়ে ইংরেজদের আমলের তিনি 'মানসী', 'মর্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি পত্রিকায় ছবি এঁকেছিলেন। এমনকি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদটি ছিল তাঁর আঁকা। ইংরেজদের বিখ্যাত 'ল্যাজারাস কোম্পানি'তে তিনি আসবাব পত্রের নকসা এঁকে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে 'আশাপূর্ণা দেবীর' মা 'সরলাসুন্দরী দেবী' ছিলেন 'লাহোর' শহরের বিখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক-'অমৃতলাল রায়ের' বোন। তাঁর মা ও বাবা দুজনেই ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি একনিষ্ঠ প্রাণ। নিজের মা-বাবা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন—

"আমাদের বাড়িতে চলতো দুটো বিপরীত হাওয়া। একদিকে বাবা আর একদিকে মা। তখনকার পরিবেশে একজন মানে বাবা রাজভক্ত, আর অন্যদিকে মা রাজ-বিদ্বেষী কট্টর স্বদেশী।...তিনি (বাবা) হাঁচি, টিকটিকি, শনি-মঙ্গল, যাত্রা-অযাত্রা, পিছুডাক, এক তারা বা এক শালিক দেখার বিপদ বিশ্বাস করতেন। আর অন্যজন (মা) এগুলো না মেনে দেখিয়ে দিতে চান এসব বাজে।"(৩)

'আশাপূর্ণা দেবী' ছিলেন এরকম পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। তাঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই, তিন বোন, মোট আটজন। সেসময়ের নিয়ম অনুযায়ী ঠাকুরমা 'নিস্তারিণী দেবীর' কড়া শাসনে বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু 'সরলাসুন্দরী দেবী' ছিলেন আধুনিকমনস্ক, চেতনাসম্পন্ন উদার মনের মানুষ। তিনি চাইতেন মেয়েরাও ছেলেদের মতো স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে, পড়াশোনা করে দেশ ও জাতিকে চিনবে। কিন্তু তার সেই অভিপ্রায় পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি। তবে তাঁর মেয়েরা বাড়িতেই কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল। তিনি নিজেও লিখতে-পড়তে জানতেন। সেকালের প্রচুর নামি পত্রিকা যেমন:—

‘নারায়ণ’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘প্রবাসী’, ‘সবুজপত্র’, ‘বসুমতী’, ‘মালঞ্চ’, ‘ভারতী’, ‘মানসী ও মর্মবাণী’, ‘অর্চনা’, ‘বালক’, ‘শিশুসাথী’, ‘বিচিত্রা’, ‘সন্দেশ’ ইত্যাদি পত্রিকার তিনি নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এছাড়াও তিনি তিনটি গ্রন্থাগার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’, ‘জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী’ ও ‘চৈতন্য লাইব্রেরী’র সদস্য ছিলেন। নিজের যেমন বই পড়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল, ঠিক তেমনি চাইতেন মেয়েরাও পড়াশুনা করুক স্কুলে যাক। তিনি বড় মেয়ে ‘রত্নমালা দেবীকে’ পড়াশুনা করাতে না পারলেও, ‘আশাপূর্ণা দেবীকে’ পড়াশুনার জন্য উৎসাহিত করতেন। কারণ সেকালের নিয়ম মেনে ‘রত্নমালা দেবী’র গৌরীদান প্রথার মাধ্যমে বিবাহ হয়ে যায়। মায়ের সদিচ্ছায় এবং নিজের অদম্য আগ্রহে ‘আশাপূর্ণা দেবী’ দাদাদের সঙ্গে বাড়িতে পড়তে বসেই আয়ত্ত করেন বাংলা বর্ণমালা পড়ার অভ্যাস। সেও ছিল অভিনব, কারণ পুস্তকের অভাবের জন্য দাদাদের পড়ার সময় উল্টো দিক থেকে দেখে দেখে বইপড়ার সুযোগ পেতো বলে, তাঁর অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল উল্টোদিক থেকে। উক্ত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —“আমি কারও কাছে লেখাপড়া শিখিনি। দাদারা পড়তেন। এই শুনতে শুনতেই পড়তে শেখা।”[৪] তাঁর মায়ের ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র পর্যাপ্ত পরিমানে বাড়িতে ছিল; তাই পড়াশুনা করার জন্য বাইরের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন তেমন ছিল না। তাঁর মায়ের বই-পত্র ছিল তাঁর দিন যাপনের একমাত্র সঙ্গী। তিনি শৈশবকাল থেকেই বই পড়তে শেখার আগেই কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেন। কারণ তিনি দাদাদের বইপড়া শুনে শুনেই মনে রাখতেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে কবিতা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের থেকে বেশী প্রাধান্য পেতো। তাঁদের দুইবোনের কবিতা মুখস্থ করে বলা ছিল একটি অন্যতম খেলা। সমালোচক ‘শিবেন্দু শেখর চক্রবর্তী’ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“আশাপূর্ণা ছোটবেলা থেকেই আর পাঁচটা মেয়ের থেকে স্বতন্ত্র

ছিলেন।...আর মায়ের প্রভাবে তাঁর পাঠ ক্ষুধাতো প্রবল ছিলই। তাই স্কুলে কোনদিন না গেলেও শিক্ষায় কোন ঘাটতি পড়েনি''।[৫]

'আশাপূর্ণা দেবী' স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, কারণ সেসময়ে সমাজ ব্যবস্থায় আর দশটা মেয়ের মতো তাঁরও বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে গৃহবন্দী জীবন 'শাপে বর' হয়ে দেখা দিয়েছিল। নিজের চাহিদা, প্রত্যাশা ও অদম্য ইচ্ছায় বইকেই একমাত্র বন্ধু করে নিয়েছিলেন। মায়ের প্রবল উৎসাহে এবং প্রশ্রয়ে পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যাংশের অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রেখেই অবিরত মুখস্থ করতেন। অবশ্য তারও আগে তাঁর আড়াইবছর বয়সে অর্জিত উল্টোদিকে শেখা অক্ষরজ্ঞান সোজাভাবে শিখে নিতে হয়েছিল। তাঁর থেকে তিনবছরের ছোটবোন 'সম্পূর্ণা দেবী'র জন্মের সময় আঁতুড় ঘরের বাইরে বসে, তিনি মাকে উচ্চস্বরে বইপড়ে শোনাতেন। অর্থাৎ আমরা সহজেই একথা বলতে পারি যে, তিনবছরের মধ্যেই তিনি বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

শুধুমাত্র পড়াশুনার ক্ষেত্রে নয়, সমস্তরকম কাজে 'আশাপূর্ণা দেবী' প্রবল আগ্রহী ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি নিত্যদিনের কাজকর্ম খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতেন। তিনি বাল্যকালে পুতুলখেলার চাইতে অন্যান্য খেলাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ছোটবেলার দিনগুলি সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন— ''আমি তো খুব ডাকাবুকো ছিলাম। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতাম, মারবেল খেলতাম, ক্যারাম খেলতাম দাদাদের সঙ্গে।''[৬] আর দশটা মেয়ের মতো তিনি ঘরকুনো বা ছিঁচকাঁদুনে ছিলেন না। তিনি সমস্ত কাজকর্ম এত দৃঢ়তার সঙ্গে করেছেন যে, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মেও সেসব কথা গল্পের আকারে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর কন্যা 'পুষ্পরেণু রায়' আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছেন—

"শুনেছি ছেলেবেলায় মার খেলাধুলা ছিল অভিনব প্রকৃতির। খেলাঘরে খেলনাবাটি সাজিয়ে খেলা এসবে মন ছিল না। ছেলেদের মতো ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলা পছন্দের খেলা ছিল। আর ছোট্ট ছোট্ট কাগজের টুকরো, মোটা পিজবোর্ড, হাতুড়ি, রাংতা জোগার করে নিয়ে দিব্যি খেলনার বাড়ি গাড়ি তৈরি করে ফেলতেন। এই সব খেলায় উৎসাহ ছিল খুব।"[৭]

যাঁর পড়াশুনা ও খেলাধুলায় এত অভিনবত্ব, তিনি যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, সেকথা তাঁর বাবা মা'ও বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই লেখিকাকে তাঁরা সমস্তরকম কাজে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যতদিন 'হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত' একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে উত্তর কোলকাতার 'বৃন্দাবন বসু লেনে'র ভাড়াবাড়িতে ছিলেন, ছেলে-মেয়েদের প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ পেতেন কম। কিন্তু যখন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আলাদা ভাবে বসবাস শুরু করলেন 'আপার সারকুলার রোডের ১৬৬ নম্বর বাড়ি'তে তখন সন্তানদের প্রতি তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। 'আশাপূর্ণা দেবী' নতুন বাড়িতে এসে অনেক কিছু শিখেছিলেন এইকথা নিজেও স্বীকার করেছেন—

"আপার সারকুলার রোডের সেই বাড়িটাকে দেখা মাত্রই আমি, আমার ছোট বোন আর দিদি একযোগে প্রেমে পড়ে গেলাম! আমরা তিন বোন ছিলাম যেন একটা ট্রিলজি'র অখণ্ড সংস্করণ। এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ"।[৮]

পূর্বে যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে 'আশাপূর্ণা দেবী' পাঁচ-ছয় বছর একত্রে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু তবু 'বৃন্দাবন বসু লেনে'র বাড়িটাই তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। কারণ সেই বাড়িতে ছিল সবার প্রাণ সঞ্চারকারী গৃহকর্তী 'নিস্তারিণী দেবী'। 'আশাপূর্ণা দেবী' পরবর্তী জীবনে ঠাকুরমা 'নিস্তারিণী দেবীর' কথা বহুবার বহুভাবে বলেছেন। ঠাকুরমা সম্বন্ধে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি হল —"দেহ ও মনে অসম্ভব শক্তিমতী এই মহিলা মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে বিধবা

হন পাঁচ ছেলে আট মেয়ে নিয়ে (যাদের মধ্যে একটি তখনো জননী জঠরে) তদবধিই ছাঁটা চুল, পরনে থান, নির্জলা একাদশী, নিত্য গঙ্গা স্নান এবং আশি বছর ব্যাপী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গঙ্গাজল পান''।[৯]

'নিস্তারিণী দেবীর' নিজের জীবনযাপনে যেমন নিয়মের কোন ত্রুটি হত না; পরিবারের অন্য কারো ক্ষেত্রেও নিয়মভঙ্গ করা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। তিনি পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী বলে বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বারণ করেছিলেন, সেই বারণ তাঁর জীবিত থাকা পর্যন্ত কেউ অমান্য করতে সাহস পায়নি। দুই প্রজন্ম ধরে সবাই তার সেই নিষেধ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। আর সেই কারণেই 'আশাপূর্ণা দেবী'র বাড়ির বাইরে স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়নি। প্রথম জীবনের শুরুতে পারিবারিক রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে প্রতিটিদিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দিদি সকলে যখন 'আপার সারকুলার রোডে'র ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে চলে আসে, তখন থেকেই তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। তিনি সমস্তরকম কাজের ক্ষেত্রে 'না' আর 'নিষেধের বন্ধন' থেকে মুক্তি পেয়ে চারপাশের জগৎকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু আগে যৌথ পরিবারে থেকেও তাঁর খেলার সাথী কেউ ছিল না, কারণ তাঁর খেলা ছিল এত কঠিন খাটুনির যে, কেউ তাঁর সঙ্গে খেলতে সহজে রাজি হত না। সেই যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের বর্ণনায় তিনি প্রায় একটি সৈন্যদলের মতো বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ঠাকুরমার পাঁচ-সাতটি সেনাবাহিনী ছিল নাতি-নাতনীদের নিয়ে। এছাড়া আটজন মেয়েদের মধ্যে কেউ না কেউ পাশে থাকতো সবসময়, আবার তাঁদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মস্ত একটা 'ভুতো সম্রাজ্যের' মধ্যে বসবাস ছিল। ছোটবেলায় তাঁর দস্যিপণাকে বাগে আনতে মা 'সরলাসুন্দরী দেবী' তাঁর হাতে বই ধরিয়ে দিতেন। আর বই পাগল ঔপন্যাসিক নিরিবিলি ঘরেরকোণে পড়ে থাকতেন, আর কেউ আঁচ করতে পারতো না দস্যি মেয়েটি কোথায় আছেন। আসলে নিজেকে

সবসময় কোন একটা কাজে ব্যস্ত না রাখলে তাঁর ভালোলাগতো না। আর জীবনের উপান্তে এসে একটি সাক্ষাৎকারে আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— ''আমি যত না লেখিকা তার চেয়ে বড় পাঠিকা''।[১০]তিনি যে প্রচুর পরিমানে বই পড়তেন, তা যেকোনো পাঠক খুব সহজে অনুভব করতে পারবেন তাঁর লেখা পাঠ করে। সমকালীন সমাজের রীতি-নীতির কারণে তাঁর স্কুলে যাওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজেই কখনো পড়াশুনায় ফাঁকি দেননি। তিনি দীর্ঘদিন উত্তর কোলকাতায় ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই একটা পাড়া-গাঁ কিভাবে ব্যস্ত নগরীতে পরিণত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, তার বর্ণনায় তিনি জানিয়েছেন—

''আমার ছোটবেলার কলকাতা ছিল সোনার কলকাতা। উত্তর কলকাতার অনেক অঞ্চলই ছিল বলতে গেলে পাড়া-গাঁ। এখানে ওখানে ডোবা, পুকুর, কচুবন। সন্ধে থেকেই শেয়ালের ক্যা-হুয়া-ক্যা-হুয়া। সকালবেলা দেখতাম আকাশে ট্যাঁ ট্যাঁ করে চক্কর খাচ্ছে শঙ্খচিল। এত বিজলি বাতি, গাড়ি-ঘোড়া তখন ছিল নাকি! রেডিয়ো টিভি ভিডিয়ো তো দূরের কথা, সিনেমা টিনেমা ছিল না, থাকার মধ্যে থিয়েটার। স্টার, মিনার্ভা এইসব''।[১১]

কলকাতায় তখন যাকিছু ছিল এবং যাকিছু ঘটত তিনি প্রায় সবটাই খবর রাখতেন। একদিকে যেমন খবর রাখতেন কোন পত্রিকায় কি প্রকাশিত হচ্ছে। অন্যদিকে সমাজ-সংস্কৃতির কোথায় কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে কিনা সেই খবরও রাখতেন। এরমধ্যে তাঁদের নিজেদের বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'আপার সারকুলার রোডে'ই। '১৫৭/১ নম্বর বাড়িটা'তে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। এই নতুন বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর দিদি 'রত্নমালা দেবীর' বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তিনজন বোনের একসঙ্গী চলে গেলে তিনি ও তাঁর বোন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে যান। সেইসময় ক্রমেই বাড়তে থাকে তাঁদের কবিতা চর্চা ও মুখস্থ বলার প্রতিযোগিতা। আর এই সাহিত্য চর্চার পরিবেশেই একদিন

সঙ্গীহারা দু'বোন নিজেরাই হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয়। যদিও চিঠির বিষয় ছিল খুব সামান্য, তবু সেই সময় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে চিঠি লেখা, সেকথা ভাবার স্পর্ধা সেকালের অনেকেরই ছিল না। কিন্তু তিনি ও 'সম্পূর্ণা দেবী' সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'কে একটি চিঠি লেখার সাহস করেছিলেন। সেই যুগের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই প্রচুর সাহস ও উদ্যমের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। এই চিঠি লেখা প্রসঙ্গে তিনি নিজেই 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

"নতুন বাড়িতে আসার পরই দিদির বিয়ে হয়ে গেল, চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। মন সর্বদাই খাঁ খাঁ। এই খাঁ খাঁ করা মনে হঠাৎ একদিন করে বসলাম একটা অসম সাহসিক কাণ্ড। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর নামে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করে ফেললাম। দুই বোনের যুগল স্বাক্ষরে। বিষয়বস্তু? কিছুই না, শুধু একটি আবেদন। 'নিজের হাতে আমাদের নাম লিখে একটি উত্তর দেবেন'। বহু কষ্টে খাম, চিঠির কাগজ এবং ঠিকানা জোগার করে পাঠিয়ে দিলাম সে চিঠি! ব্যাস, তারপরই শুরু হল বুক ধড়ফড়, ভয়"।[১২]

অবশ্য বেশীদিন এরকম অবস্থায় কাটাতে হয়নি। চিঠি লেখার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' স্বহস্তে লেখা প্রতি-উত্তরের চিঠি তাঁরা পেয়ে যায়। তাতে লেখা ছিল "আশাপূর্ণা তুমি সম্পূর্ণা"[১৩]। আর তার পরেই পরিবর্তন ঘটে যায় 'আশাপূর্ণা দেবীর' জীবনে। তিনি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' লেখা চিঠিতে যে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাকেই কার্যে রূপ দিতে হঠাৎ একদিন 'শিশুসাথী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটির নাম ছিল 'বাইরের ডাক'। ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'শিশুসাথী' পত্রিকা আয়োজিত সেই কবিতা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। পত্রিকার

সম্পাদক ‘রাজকুমার চক্রবর্তী’ পরবর্তীকালে তাঁকে গল্প লিখে পাঠাবার অনুরোধ জানান। অর্থাৎ একথা আমরা বলতে পারি ‘শিশুসাথী’ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই তিনি সাহিত্য জগতে সম্মুখপানে চলার প্রেরণা লাভ করেন। আর ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের’ প্রেরণ করা চিঠি ছিল সাহিত্য জগতে পদার্পণ করার ছাড়পত্র।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ স্বীকার করেছেন সাহিত্য জগতে তাঁর প্রতিভার বিস্তারে সহযোগিতা করেছিল সেযুগের পত্রিকা সম্পাদকেরা। তাঁদের ঋণ তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য প্রথমজীবনে সেই কবিতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রাপ্তির কথা পরবর্তী জীবনে তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন –

“আমার সাহিত্য জীবনের মূলে কিন্তু সেযুগের সম্পাদকেরা। তাঁরা যদি আমাকে লেখা পাঠাতে না বলতেন, তা হলে আর লেখা পাঠাতাম না, আমার সাহিত্য জীবনের ওখানেই ইতি হয়ে যেত”।[১৪]

ওখানেই বলতে লেখিকার প্রথম কবিতা ‘বাইরের ডাক’ লেখার কথা বলেছেন। ঔ কবিতা লেখার জন্যই ছোটগল্প লেখার অনুরোধ আসে, আর তারপর—“পীচঢালা রাস্তায় গড়গড়িয়ে গাড়ি চালিয়ে যাই। প্রথম গল্প লেখার পরে আবার চিঠি এসে যায়, আবার লিখি। ...অন্য শিশু পত্রিকা থেকেও চিঠি এসে পড়ে। মৌচাক, রংমশাল, খোকা-খুকু ইত্যাদি”।[১৫]

পত্রিকার সম্পাদকদের ঋণ তিনি জীবনে বহুবার বহুভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগীতা যথাযথ ভাবে না পেলে তাঁর কোনদিন আর লেখিকা হওয়া হত না। অবশ্য কবিতা লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হলেও, শেষপর্যন্ত তিনি একটি কাব্যও প্রকাশ করেননি। তুলনায় ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি খুব বেশী সাবলীল ছিলেন।

‘শিশুসাথী’ পত্রিকার পর ‘খোকাখুকু’ নামে আর একটি পত্রিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে; আর সেখানেও তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী পনেরোবছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলো। প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ নাম ঘোষণা হওয়ার পর পুরস্কার প্রদানে কয়েক মাস দেরি হয়ে যায়। ততদিনে তাঁর বয়স পনেরো বছর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এবং সেকথা তিনি ‘খোকা-খুকু’র সম্পাদক ‘নিশিকান্ত সেন’ মহাশয়কে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন। সবাই ভেবেছিল এই পুরস্কার আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু ‘নিশিকান্ত সেন’ মহাশয় পুরস্কার তো পাঠান, উপরন্তু তাঁর চিঠি লিখে সত্যকথা জানানোর জন্য আরোও একটি বাড়তি পুরস্কার পাঠিয়ে দেন। এভাবে সমকালীন সম্পাদকদের আশীর্বাদ ও আগ্রহে তাঁর একজন যথার্থ সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়। এরপর কয়েক মাসের মধ্যে ‘আশাপূর্ণা দেবীর’ বিয়ে ঠিক হয় কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়া নিবাসী ‘নরেন্দ্র নাথ গুপ্ত’ ও ‘সরোজিনী দেবীর’ জ্যেষ্ঠ পুত্র বাইশ বছর বয়সী ‘কালিদাস গুপ্তের’ সঙ্গে। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার প্রসঙ্গে লেখিকা খুব সুন্দর করে জানিয়েছেন—

“পুরস্কারলব্ধ অনেকগুলো ভালো ভালো বই, যার মধ্যে ছিল ‘রাজকাহিনী’ ‘ক্ষীরের পুতুল’ ‘নালক’ ‘নীল পাখি’ ‘টমকাকার কুটির’ ‘শিশু ভোলানাথ’ ইত্যাদি নতুন টাঙ্কে পুরে নিয়ে এক গলা ঘোমটা টেনে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের ট্রেনে চেপে গুটি গুটি শ্বশুর বাড়ি যাত্রা! সেটা হচ্ছে বাংলা ১৩৩১ সাল। ব্যাস সেইখানেই ছেলেবেলার ইতি”।[১৬]

এরপর শ্বশুর বাড়িতে নতুন করে জীবন শুরু করলেন ‘আশাপূর্ণা দেবী’। তাঁর স্বামী চাকরি করতেন কোলকাতায় ‘মারকেনটাইল ব্যাঙ্কে’। প্রতি সপ্তাহে একবার কৃষ্ণনগর যাতায়াত করতেন। স্বামীর পরিশ্রম লাঘব করার জন্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে (আনুমানিক) ‘ভবানীপুরের রমেশ মিশ্র রোডে’ বাড়িভাড়া করে তাঁরা

সপরিবারে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি লেখালিখির পুরোনো জগতে প্রবেশ করলেন। দুই বছরের মতো সময় জুড়ে তাঁর লেখায় একটু ভাটা পড়েছিল; আবার সেই সৃজনের কাজ মসৃণ রাস্তায় চলতে থাকল। শ্বশুর বাড়ির প্রত্যেকে মা, বাবা ও দুই দেবর কেউ তাঁর লেখার বিষয়ে বিরূপ কোনো মন্তব্য করেননি, বরং খুশি হয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন—

"আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার লেখার ব্যাপারে কোনো বাধাই আসেনি। বরং আমি লিখি শুনে সবাই খুশি ছিলেন। তাছাড়া আমার বাপের বাড়ির পরিবার ছিল বড়, বরং সময় ছিল কম। শ্বশুর বাড়ির পরিজন ছিল ছোট, লেখার ব্যাপারে তাই অসুবিধে হয়নি"।[১৭]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে 'আশাপূর্ণা দেবী' প্রথম সন্তানের জননী হয়েছিলেন। ১৯২৬-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি 'পুষ্পরেণু', 'প্রশান্ত' ও 'সুশান্ত' নামে তিন সন্তানের জননী হয়েছিলেন। সংসার ও সন্তানদের সমস্তরকম কাজ-কর্ম সামলানোর পরেও তিনি সাহিত্য রচনার জন্য সময় বের করে নিতেন। যদিও সন্তানদের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল, তবু কোথাও কোনরকম কাজে খামতি পড়েনি। বেশীরভাগ সময়টা তাঁর নিজের শিশুকন্যাদের নিয়ে থাকতে হত বলেই হয়তো ১৯২২-৩৬ সাল পর্যন্ত ছোটদেরকে নিয়েই ছোটগল্প লিখেছেন। তিনি ছোটদের মনস্তত্ব খুব ভাল করে বুঝতে পারতেন বলেই হয়তো দীর্ঘদিন শুধু ছোটদের জন্যই ছোটগল্প লিখেছেন। প্রথম ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থের নাম 'ছোটঠাকুর্দার কাশীযাত্রা'; ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে তাঁর সন্তানরা বড় হয়ে উঠতে থাকলে, বড়দের জন্যও তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর বয়স যখন আঠাশ বছর (১৯৩৬) সেসময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বড়দের জন্য প্রথম ছোটগল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' প্রকাশিত হয়। তাঁর বড়দের জন্য ছোটগল্প লেখা কিছুটা দেরি হওয়ার কারণ হিসাবে তিনি তত্কালীন সামাজিক

অবরোধজনিত সংকোচের কথা বলেছেন। তিনি আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন –

"তখন মনে হত—বড়দের জন্য লেখা মানেই তো প্রেম-ট্রেম অর্থাৎ নর-নারী ঘটিত ব্যাপার? তার মানেই তো —আবেগ অস্থিরতা রোমান্টিক সিন-ফিন এসে যাওয়া? সেই বস্তু গুরুজনদের চোখে পড়বে, না বাবা কাজ নেই"।[১৮]

অবশ্য তিনি জীবনের প্রারম্ভে একবার লেখা শুরু করে আর মাঝপথে এসে কোনদিন তা বন্ধ করে দেননি। তিনি দীর্ঘ ১২-১৪ বছর শিশু সাহিত্য রচনা করে যখন বয়স্কপাঠ্য ছোটগল্প রচনায় হাত দিলেন, তারপর শুধুই এগিয়ে যাওয়ার পালা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'জল আর আগুন' নামে প্রথম বয়স্কপাঠ্য ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয় 'দাশগুপ্ত এণ্ড কোং' প্রকাশক সংস্থা থেকে। একদিকে যখন তাঁর নতুন সংসার ভরে উঠেছে অন্যদিকে লেখার জগতে নতুনত্বের আহ্বান। অনবরত তিনি লিখে যাচ্ছেন এরকম সময় তাঁর মা 'সরলাসুন্দরী দেবী' পরলোক গমন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সারা দেশে যখন দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, অনাহারে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসে। যদিও ছোটবেলায় তিনি 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের' ভয়াবহতা হয়তো কিছুটা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার দরুণ বহির্জগতের ওঠা-নামা স্পষ্ট করে ঠিক ততটা বুঝে উঠতে পারেননি বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কন্যা পুষ্পরেণু দেবীর বিবাহ দেন বাঁকুড়ার রায় পরিবারের 'অতুল কৃষ্ণ রায়ের' সঙ্গে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয় 'কমলা পাবলিশিং' থেকে। তাঁর কথায়—

"প্রথম উপন্যাস? সেটা আর এক কাহিনী। যার অন্তরালে ছিল প্রয়াত প্রীতিভাজন বন্ধু বিশু মুখোপাধ্যায়ের ষোলআনায় অবদান। তিনি প্রায় জোর করেই আমাকে দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে ছিলেন"।[১৯]

তারপর থেকে তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস সমান তালে লিখতে থাকেন,

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’ থেকে ‘লীলা পুরস্কার’ লাভ করেন। এরই মধ্যে যেসব উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প প্রকাশিত হয় সেগুলি হল —‘জল আর আগুন’, ‘মেকী টাকা’, ‘বিস্ফোরণ’, ‘রঙিন মলাট’, ‘শকুন্তলার পরাজয়’, ‘বীরাঙ্গনা’, ‘সিঁধকাঠি’, ‘কঙ্কাবতীর ইতিকথা’, ‘মায়া কাজল’, ‘তাজমহল’, ‘মাপকাঠি’, ‘ছিষ্টিছাড়া’, ‘হোমশিখা’, ‘বহুরূপী’, ‘ছেঁড়াতার’, ‘বাজে খরচ’, ‘চেঞ্জ’, ‘বন্দিনী’, ‘কালের হাওয়া’, ‘পদাতিক’, ‘স্বাধীনতার সুখ’, ‘নীলকণ্ঠ’, ‘অভিনেত্রী’, ‘স্বর্গাদপি’, ‘শোলার ফুল’, ‘পত্রাবরণ’, ‘স্বীকারোক্তি’, ‘নিখাদ’ ইত্যাদি ছোটগল্প। প্রথমদিকে তিনি ছোটগল্প বেশী লিখেছেন, উপন্যাস লেখা শুরু করেন পরবর্তী সময়ে এবং ‘লীলা পুরস্কার’ প্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চার-পাঁচটি ছিল। এর পরবর্তী সময়ে অবশ্য তাঁর লেখার গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, লেখার মানের গভীরতা ক্রমে গুণীজনমহলে সমালোচিত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য দীর্ঘদিন তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় থাকলেও ব্যক্তি ‘আশাপূর্ণা দেবী’কে তেমনভাবে কেউ জানতেন না। সকল পাঠকই ভেবেছিলেন নারীর ছদ্মনামে কোন পুরুষ ঔপন্যাসিক লিখছেন। তাছাড়া তাঁকে চিহ্নিত করবার তেমন কোন উপায় ছিল না। কারণ পত্রিকার দপ্তরে তাঁর বেশীরভাগ লেখা তিনি ডাকযোগে পাঠাতেন অথবা তাঁর স্বামী কিংবা দেবর পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। রক্ষণশীল সংস্কার সম্পন্ন বাড়ির বৌ হওয়ার কারণে তাঁকে দীর্ঘদিন অবরোধের মধ্যেই থাকতে হয়েছিল। একমাত্র লেখালেখির মধ্য দিয়েই বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। অবশ্য একটা সময় আসে যখন তাঁকে ঘোমটার আড়াল থেকে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসতে হয়। কারণ পাঠকদের চাহিদা দিনের পর দিন ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। আর তাঁর লেখার গুণেই সাহিত্যিকের যথার্থ মর্যাদা গ্রহণ করার জন্য সাহিত্যের দরবারে সশরীরে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দীর্ঘদিন অবরোধ বাসিনীর জীবন যাপন করার পর বাইরের জগতে

বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

"চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেউ জানতো না, আশাপূর্ণা দেবী আসলে কে? ওটা কোন পুরুষের ছদ্মনাম নয় তো? পরে যখন বাইরের জগতে বেরিয়ে পরে সকলের সঙ্গে দেখা-টেকা হয়েছে, অনেকে বলেছেন, এই যেমন প্রেমেন দা (প্রেমেন্দ্র মিত্র), সজনী কান্ত দাশ — আমরা তো ভাবতাম ওটা বোধহয় একটা ছদ্মনাম, আসলে পুরুষের লেখা[২০]।

পাঠকদের ভুল ভাঙাতে লেখিকা 'আশাপূর্ণা দেবী' ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরের জগতে পা রাখলেন। কবি 'নরেন্দ্র দেবে'র অনুরোধে তিনি বাড়ির সিংহ-দুয়ারের বাইরে একজন লেখিকার পরিচয় নিয়ে সর্বপ্রথম বেরিয়ে আসেন ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'কথাশিল্প' নামে একটি ছোটগল্প-সংকলনের জন্য আয়োজিত ছোটগল্প রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়'কে শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য তিনি পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এরপর শ্রীরামপুরের 'বনফুল' নামক সাহিত্য-সংস্থা আয়োজিত সভায় প্রথম তিনি সভানেত্রী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপর আর কোনদিন তাঁকে অবরোধবাসিনী জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' তাঁকে "ভুবন মোহিনী স্বর্ণপদক" পুরস্কারে সম্মানিত করে। তিনি এইসময় তাঁর বিখ্যাত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসটি রচনা করতে থাকেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'মিত্র ও ঘোষ প্রা: লি:' থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই তিনি 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে' যোগ দেওয়ার জন্য 'কটক শহরে' চলে যান, এবং বাংলাসাহিত্য শাখার অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। সেইসময় থেকে 'নরেন্দ্র দেব', 'রাধারাণী দেবী', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', 'সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়', 'বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'বনফুল', 'সজনী কান্ত দাশ', 'পরিমল গোস্বামী', 'গজেন্দ্র কুমার মিত্র', 'সুমথ নাথ ঘোষ', 'মহাশ্বেতা

দেবী', 'নরেন্দ্র নাথ মিত্র', 'শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়', 'নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী', 'সবিতেন্দ্র নাথ রায়' প্রমুখ বাংলাসাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার বিষয় ছিল সমকালীন ভারতবর্ষে চিনের আক্রমণ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল —"চিনের আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার সাহিত্যিক সমাজের রোষ ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ"[২১]। পরের বছর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তত্কালীন 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার' 'আশাপূর্ণা দেবী'কে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সুবর্ণলতা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংসার ও সামাজিকতার চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর লেখালেখির সঙ্গে তিনি কোনদিন আপোষ করেননি। তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। তাঁর লেখা উপন্যাস হিন্দি ভাষায় সবচেয়ে বেশী অনুবাদিত হয়েছে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'অগ্নিপরীক্ষা' নামক উপন্যাসটি প্রথম হিন্দিতে অনুবাদিত হয়। ১৯৬৪ থেকে ২০০০ পর্যন্ত তাঁর ১২০ টি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। 'হংস কুমার তেওয়ারী' 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের প্রথম হিন্দি অনুবাদ করেন। অবশ্য এই অনুবাদের পরেই লেখিকা হিসেবে তাঁর পরিচিতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ি শহরে আয়োজিত 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'এর অধিবেষণে তিনি কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই সভায় সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন—

"এমন কোনো জীবন থাকতে পারে না যার মধ্যে উপন্যাসের উপকরণ নেই। এমন কোনো 'বিষয়' নেই যা সাহিত্যের বিষয় বস্তু হতে পারে না। সাহিত্যিকের কাজ, শুধু সেটি হাতে তুলে নিয়ে সামান্যের মধ্য থেকে 'অসামান্য'কে খুঁজে বার করা, সাধারণের মধ্য থেকে অসাধারণকে আবিষ্কার করা। ...কথাই তো 'জীব' জগত থেকে মানুষ জাতটাকে পৃথক করেছে, ...কথাই সভ্যতার বাহন,

সংস্কৃতির বাহন। ...কথাই 'বাণী' কথাই 'ব্রহ্ম' ...কথার মধ্য দিয়ে মানব মনের মুক্তি। সে মুক্তি স্রষ্টারও, ভোক্তারও"।[২২]

এরকম যুক্তি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' জামশেদপুরেও সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি তিনি ত্রয়ী উপন্যাসের শেষখণ্ড 'বকুলকথা' রচনা করেন; গ্রন্থটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপরের বছরেই 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা (মাসিক পত্র, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) 'আশাপূর্ণা দেবী সম্বর্ধনা সংখ্যা' প্রকাশিত করে। সেই সংখ্যায় লেখিকা 'আশাপূর্ণা দেবী'র প্রসঙ্গে অনেক গুণী লেখক তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেন। প্রখ্যাত ভাষাচার্য 'সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়', 'হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়', 'প্রমথ নাথ বিশী', 'রাধারাণী দেবী', 'লীলা মজুমদার', 'গজেন্দ্র কুমার মিত্র' প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ 'কথাসাহিত্যের' সেই সংখ্যায় প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এরপর আসে তাঁর জীবনের সেই স্মরণীয় মুহূর্ত; তিনি সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বকালের মরমী কথাকার রূপে একই বছরে 'জ্ঞানপীঠ' ও 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেলেন। আর কোনো কথাসাহিত্যিকের জীবনে এমন বিরলতম ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না। ঐবছরে 'শিশু সাহিত্য পরিষদ' থেকে তাঁকে 'ভুবনেশ্বরী পদক' দেওয়া হয়। অনেক সম্মান ও পুরস্কার তিনি পেয়েছেন যা অন্যকোন সাহিত্যিকের থেকে অনেক বেশী বলে মনে হয়। উক্ত সমস্ত পুরস্কার প্রাপ্তি ও জীবনের সমস্ত কর্মের যখন মূল্যায়নের সময় এলো, সেই বছর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনের সমস্ত কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গী 'কালিদাস গুপ্ত' দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেন। যার ফলে তিনি সেসময় সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়েন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে দিল্লী যেতে হয়েছে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। উল্লেখ্য ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে ভূষিতা

হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর প্রয়াণ অন্তরে গভীরতম বেদনার সৃষ্টি করেছিল বলেই তিনি পুরস্কার গ্রহণ করতে যেতে পারেননি। 'মহাশ্বেতা দেবী' উক্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

"বয়সে বৈধব্য অনেকেরই আসে। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই, জীবন সঙ্গী চলে যাওয়া মানে তাঁকে একলা করে রেখে যাওয়া। তখন থেকেই কি বাঁচার ইচ্ছে অবচেতনে তুলে নিয়েছিলেন?"(২৩)

কিন্তু তবু তাঁর চিরকালের সঙ্গী 'কলম'টিকে কোনমতেই তুলে রাখতে পারলেন না, যাঁকে দিয়ে তাঁর এতদিনের সৃষ্টির পথ চলা। তিনি এরপরেও একটির পরে আরো একটি করে সৃষ্টি করেছেন নতুন থেকে নতুনতর শিল্পকর্ম। যদিও তাঁর স্বামীর পরলোক গমনের কারণে যদিও একটি বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে সাহিত্য রচনায় ছেদ পড়েছিল।

জীবনে সায়াহ্ন পর্বে 'আশাপূর্ণা দেবী' অনেক সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সম্মান সূচক 'ডক্টরেট উপাধি' লাভ করেন। তাছাড়াও তিনি একাধারে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'হরনাথ ঘোষ পদক', ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সম্মান সূচক 'ডক্টরেট উপাধি', ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে 'বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'ডক্টরেট উপাধি', ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'বিশ্বভারতী' থেকে 'দেশিকোত্তম উপাধি', ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' তাঁকে সম্মান সূচক 'ডক্টরেট উপাধি', ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য আকাদেমি'র 'ফেলো' নির্বাচিত হন। এত সম্মান ও পুরস্কার তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালে খুব কম কথাসাহিত্যিকরা পেয়েছেন বলে মনে হয়।

তিনি যেমন তাঁর লেখার গুণে অনন্য, তেমনি সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্তির দিক থেকেও ব্যতিক্রমী। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও 'শরৎ পুরস্কার' একাধারে দুটি সম্মানেই সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি অর্ধেক জীবন বাড়ির অন্তঃপুরে, আর বাকি অর্ধেক জীবন সমৃদ্ধ সমাজের বৃত্তে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর অন্তঃপুরের পর্দা উঠল, ততদিনে পৃথিবীর মানুষ নতুন যুগ তৈরি করেছে। এতদিনের তাঁর দেখা বৃত্তের মানুষের সঙ্গে এই যুগের কোনো মিল নেই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতি তিনি তেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি বলে মনে হয়। আর তাই হয়তো তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। আসলে রাজনীতির প্রতি তাঁর কোনদিনই তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁর নিজের কথায়—

"রাজনীতি সম্পর্কে আমার বরাবরই অনীহা।...বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের কাঠামোর ওপর রচিত কোনো সাহিত্য আমায় কখনোই আকর্ষণ করে না। তা সে তৎকালীন জন-জীবনকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করলেও। ...যে সত্য কেবলমাত্র তৎকালীন, 'চিরকালীন' নয়, সেটা আমায় কখনোই আপ্লুত করে না"।[২৪] অবশ্য একথাও বলতে হবে তিনি নিজেও কখনো রাজনীতি করেননি, কোনো বিশেষ মতাদর্শে চিরকাল নিজের বিশ্বাস অটুট রাখেননি। কারণ তিনি মানতেন যে, মানুষ নিজেই অলসতা ত্যাগ করে যেদিন জেগে উঠবে সেদিনই হবে মানুষের প্রকৃত জয়। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি শুধু লেখালেখির জগতে ব্যস্ত ছিলেন, নতুন নতুন বহুচরিত্র তৈরি করেছেন, কেবলমাত্র অর্ধমৃত মানুষের আঁতে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলার জন্য। তিনি বাইরের জগতের টানা-পোড়েন নিয়ে বিশেষভাবে কোন কথা বলেননি, লিখেছেন মানুষের জীবনের অন্তঃপুরের কথা। যে অন্তঃপুরে বাইরের সমাজের সমস্তরকম ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে কল্লোলিত হয়ে ওঠে। আসলে তিনি সোজাসুজি বাইরের কথা না লিখলেও অন্তঃপুরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বহির্বিশ্বকে জানার চেষ্টা করেছেন, এবং

বাইরের জগত ও অন্তঃপুরের মিল দেখিয়ে আধুনিক জন-জীবনের প্রকৃত চিত্ররূপ অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কখনোই লেখেননি সমাজের বৃত্ত কিরকম, কিভাবে ও কেমন হওয়া উচিত? সমাজে যা কিছু ঘটে তাই তিনি সর্বদাই লিখেছেন তাঁর সাহিত্যের পাতায়। তিনি যেমন তাঁর শৈশবের ভারতবর্ষ কে দেখেছেন, তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষকেও দেখেছেন, তাই দুই রকম অবস্থারই বর্ণনা তাঁর রচিত সাহিত্যে আছে। তিনি অবশ্য বলতেন–"আমি পুরনো নৈতিকতায় বিশ্বাসী"[২৫], কিন্তু তাঁর আধুনিক কালের দ্বন্দ্ব সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক 'নবনীতা দেবসেন' আলোচ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— "আমি তো জানি, পিসিমা পশ্চিম সাহিত্য কিছুই পড়েননি। তাঁর 'আধুনিকতা' সবটাই নিজস্ব জীবন থেকে শেখা। তার এতটুকুও ধার করা নয়। তিনি সশিক্ষিত, আমাদের মতো ইংরেজী শিক্ষিত নন। আমার মা- মাসিরা সকলেই যেমন, তিনিও তেমনই। অথচ কী করে তিনি নাগাল পান আধুনিকতার মূল্যবোধের, সন্ধান পান মোক্ষম মৌল সব যন্ত্রনাগুলোর। কিভাবে তিনি ধরতে পারেন চলতি যুগের নাড়িটা চেপে! সার্থক বদ্যির মেয়ে"।[২৬]

উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে আমরা খুব সহজে স্বীকার করে নিতে পারি, তিনি সত্যি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। আর তাই হয়তো অনেক প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকদের রচনার পাশে আজও কালের নিয়মে তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠিত ও পর্যালোচিত হয়ে থাকে।

<<<<<>>>>>

তথ্যসূত্র

১) ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকাংশ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩.

২)আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯.

৩) আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬ (আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে : সুব্রত সেনগুপ্ত), পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪.

৪) আনন্দমেলা, সম্পাদক- শ্যামল কান্তি দাস, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

৫) 'আত্মবিকাশ' সাহিত্য পত্রিকা, শতপুষ্পে বিকশিত আশাপূর্ণা, প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন-আগষ্ট :২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪২.

৬) আজকাল, কলকাতা সংখ্যা, ১৩৯৬ (আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে : সুব্রত সেনগুপ্ত), পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪.

৭) পুষ্পরেণু রায়, আশাপূর্ণা মা, প্রকাশক : অভিনব প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: ২০০৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯.

৮) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৮.

৯) আভা, শারদীয়া আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- সমীরণ রুদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক১৩৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭১.

১০) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা— ২৮.

১১) আনন্দমেলা, সম্পাদক- শ্যামল কান্তি দাস, ১৭ ই সেপ্টেম্বর : ১৯৮৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২.

১২) আমার ছেলেবেলা, আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৪২.

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা— ৪২.

১৪) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬.

১৫) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৩.

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা — ৪৪.

১৭) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৮.

১৮) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৫.

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা — ২৬.

২০) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা— ২৯.

২১) আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪৭.

২২) তদেব — ১৬১.

২৩) দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, (সাক্ষাৎকারে : চিত্রা দেব), পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৬.

২৪) আশাপূর্ণা দেবী, উপাষণা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭.

২৫) আমার ছেলেবেলা, আশাপূর্ণা দেবী, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ-১৪১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৪.

২৬) কথাসাহিত্য, ‘আমার প্রসিদ্ধা পিসিমা এবং বেচারী আমি’- নবনীতা দেবসেন, কার্তিক ১৩৮১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩১.

<<<<<>>>>>